হাঁপানি ঃ একটি অতি পরিচিত রোগের নাম ... ১
ইনজেকশন : পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ... ৩
প্রসূতির সুষম খাদ্য ... ৫
কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে ... ৭

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ কার্তিক ১৪০১

হাঁপানি ঃ একটি অতি পরিচিত রোগের নাম

ডাঃ কামরুন নাহার

'হাঁপানি' বা 'এ্যাজমা' একটি অতি পরিচিত অসুখের নাম। হাসপাতালে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে যত রোগী আসে তার বেশিরভাগই আসে এ্যাজমা বা হাঁপানিজনিত শ্বাসকষ্ট নিয়ে। এ-রোগের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ-রোগ ছোটবেলায় শুরু হয়। তবে যেকোনো বয়সে মানুষ এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ-রোগটি কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। কোনো বিশেষ জীবাণু দ্বারা এ-রোগ সংক্রমিত হয়না। তবে 'এলার্জি' এ-রোগের একটি বড় কারণ। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিশেষ খাবার বা জিনিসের প্রতি 'এলার্জিক' হন তাহলে ঐ জিনিসের সংস্পর্শে এলে তার হাঁপানি শুরু হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ঠান্ডালাগা থেকেই এ-রোগ শুরু হয়। তবে ঘরের ধূলাবালি, হাঁস-মুরগির পালক, কতিপয় ফুলের রেণু, কোনো কোনো খাবার বা ঔষধ এ-রোগের কারণ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নায়বিক দুর্বলতা বা অতিরিক্ত চিন্তা থেকেও এ-রোগ হতে পারে। এ-রোগটি বংশগতও হতে পারে। সেজন্য হাঁপানি আছে এমন বাবা-মায়ের সন্তানদের এ-রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রোগের লক্ষণ

কারণে-অকারণে মাঝে মাঝে ভীষণ শ্বাসকষ্ট এ-রোগের প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ শেষরাতে বা সকালবেলা এ-রোগের লক্ষণ শুরু হয়। শুরুতে রোগীর বুকে ভার-ভার অনুভূত হয়। খুসখুসে কাশির সাথে সাদা কফ বের হয়। বুকের মধ্যে শাঁ-শাঁ শব্দ হয়। সাথে জ্বরও থাকতে পারে। আস্তে-আস্তে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব'সে শ্বাস নিলে একটু সুস্থ বোধ করে। তবে কখনও কখনও এ-রোগ চরম আকার ধারণ করে যা Severe Acute Asthma নামে পরিচিত। এসব রোগীদের শ্বাসকষ্ট এত বেশি থাকে যে সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও ফুসফুস প্রয়োজনীয় বাতাস নিতে পারে না। এসময় শ্বাসকষ্টের সাথে-সাথে নাড়ীর গতি বেড়ে যায়, রোগীর ঠোঁট, জিহবা, নাকের পাতা নীল হয়ে যেতে পারে। 'এ্যাজমা' একবার হলে সারা জীবনই যেকোনো সময়ে এর আক্রমণ হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস এ-রোগ নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট। পারিবারিক ইতিহাস এক্ষেত্রে বহুলাংশে সহায়ক হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে প্যাথলজিকেল পরীক্ষার দরকার হয় না। তবে এ-রোগের সাথে অন্য রোগের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য কিংবা রোগের জটিলতা বোঝার জন্য বুকের এক্স-রে করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

'এ্যাজমা' রোগ সম্পূর্ণভাবে সারানোর জন্য কোনো ঔষধ নেই, তবে এ-রোগের চিহ্নিত কারণগুলো পরিহার করে চললে এ-রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে রোগের প্রকোপ শুরু হলে কিছু কিছু ঔষধ এ-রোগের তীব্রতা কমাতে পারে। এসময় রোগীকে বিছানায় পিছনে ঠেকা দিয়ে আধাশোয়া অবস্থায় রাখলে শ্বাসকষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। এ-রোগের উপসর্গ উপশমের জন্য বাজারে বিভিন্ন রকমের ঔষধ পাওয়া যায়, যেমন ইফেড্রিন, সালবিউটামল, থিওফাইলিন ইত্যাদি। ডাক্তারের পরামর্শমত এসব ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। তবে Severe Acute Asthma-এর ক্ষেত্রে রোগীকে সংগে-সংগে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিরোধ

একজন হাঁপানি রোগী যেসমস্ত জিনিসের প্রতি 'এলার্জিক' সেগুলো পরিহার করতে হবে। ঘরবাড়ি ও কর্মস্থল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শমত হাঁপানি রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ঔষধ যেমন, সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট, কিটোটিফেন ব্যবহার করা যেতে পারে।

জটিলতা

Severe Acute Asthma অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী আকার ধারণ করে। এধরনের রোগীরা নিউমোনিয়ায় ভুগতে পারে, বারবার হাঁপানিতে আক্রান্ত হলে হৃদপিন্ডের অসুখ হতে পারে যার পরিণতিতে হাত-পা, সারা শরীর ফুলে উঠে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

তবে কখনও কখনও এমনিতেই এ-রোগ সম্পূর্ণ ভালোও হয়ে যেতে পারে।

প্লেগ

সংলাপ রিপোর্ট

প্লেগ একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। "ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস" নামক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। চৌদ্দ শতকে এই রোগটি ইউরোপে ভয়াবহ মহামারীর আকারে দেখা দেয় এবং "ব্ল্যাক ডেথ" নামে পরিচিত ছিল। তাই আজও প্লেগাক্রান্ত রোগীর খবরে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের সুরাট নগরীতে এবং পরে দিল্লী ও কলিকাতায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের খবরে সবাই আতংকিত। কারণ প্লেগ রোগের লক্ষণ এখনো আগের মতই আছে। তবে বর্তমানে প্লেগ প্রতিরোধের বহুবিধ পদ্ধতি রয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য রয়েছে কার্যকর ও সুলভ এন্টিবায়োটিকস। সুতরাং এই রোগ নিয়ে আতংকিত না হয়ে যথাযথ সচেতনতা ও প্রতিরোধের পদক্ষেপ নেওয়াই জরুরী, কেননা সময়মত সক্রিয় পদক্ষেপ নিলে প্লেগ রোগ অবশ্যই প্রতিরোধ করা যায়।

প্লেগ রোগ কিভাবে ছড়ায়?

ঘনবসতিপূর্ণ, নোংরা আবর্জনা ও ইঁদুরবহুল স্থানে বসবাসরত মানুষের মাঝে এ-রোগ সহজে ছড়ায়। এটি মূলতঃ প্রাণী যেমন: ইঁদুর, কাঠবিড়ালির রোগ। বনে-জংগলে বা পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ইঁদুরের মধ্যে সাধারণতঃ প্লেগ রোগ হয়ে থাকে। ইঁদুরের চামড়ায় র‍্যাট ফ্লী নামক একধরনের অতি ক্ষুদ্র পরজীবী পাখাহীন পোকা বাস করে। এইসব পরজীবী পোকা উষ্ণ রক্তপায়ী, আর এই পোকা মারাত্মক প্লেগ রোগের বাহক। প্লেগের জীবাণু-সংক্রমিত র‍্যাট ফ্লী'র বাহক ইঁদুর ফসলী মৌসুমে অথবা ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা-পরবর্তী সময়ে বন-জংগল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে। এসময়ে লোকালয়ের ইঁদুরের সাথে বন্য ইঁদুরের সখ্যতা গড়ে ওঠে। ফলে লোকালয়ের ইঁদুরগুলির মধ্যে র‍্যাট ফ্লী'র সংক্রমণ ঘটে। এই সংক্রমিত ইঁদুর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। তখন র‍্যাট ফ্লী মৃত ইঁদুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্তের সন্ধানে অন্য ইঁদুর খুঁজে নেয় অথবা মানুষকে কামড়ায়। র‍্যাট ফ্লী থেকে মানুষের মধ্যে প্লেগের

সংক্রমণ ঘটলে প্রথমে আক্রান্ত রোগীর গ্রন্থি (Lymph node) ফুলে যায় (bubo)। এটাকে বলা হয় বিউবোনিক প্লেগ। পরে রক্তে সংক্রমণ ঘটে এবং তাকে বলে সেপটেসেমিক প্লেগ। যেহেতু এই প্লেগের সংক্রমণ ঘটে সরাসরি রক্তে এবং রোগীর সংকট শুরু হয় দ্রুত, সময়মত চিকিৎসা শুরু না হলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। আর তারপরই রোগীর শ্বাসতন্ত্রে এ-রোগ ছড়িয়ে পড়ে, ফলে নিউমোনিক প্লেগের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। এসব রোগীর সংস্পর্শে আসলে বা রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সুস্থ লোকের মধ্যে প্লেগ ছড়ায়। তখন আক্রান্ত ব্যক্তি নিউমোনিক প্লেগ রোগে ভোগে। আর নিউমোনিক প্লেগ হলেই দেখা যায় প্লেগের মহামারী।

রোগের লক্ষণসমূহ

প্লেগ-আক্রান্ত রোগীর জ্বর, শরীরে প্রচন্ড ব্যথা, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট হয় অথবা গ্রন্থি বা গ্লান্ড বা নাসিকা ফুলে যায়, ব্যথা হয়। এই রোগের সুপ্ত অবস্থা বা রোগবীজ শরীরে প্রবেশের পর লক্ষণ দেখা দেবার মধ্যবর্তী সময়টুকু (Incubation period) ২ থেকে ৭ দিন অর্থাৎ এসময়ের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা নাও দিতে পারে।

প্লেগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

রোগের শুরুতে চিকিৎসা করলে সহজেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

* কারো যদি সর্দি-কাশি, জ্বর, বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হয় অথবা জ্বর ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ত্বকের নিচের গ্রন্থিতে বা গ্লান্ডে ব্যথা হয়, ফুলে যায় তাহলে সংগে সংগে টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল ২টা করে ৬ ঘন্টা পর পর খালি পেটে ৭ দিন খাবেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। শিশুদের ক্ষেত্রে কো-ট্রাইমোক্সাজল সিরাপ সেবনযোগ্য।
* বিনা কারণে অযথা ঢালাওভাবে টেট্রাসাইক্লিন খাবেন না। তবে প্লেগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য কর্মীগণকে টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল ১টা করে ৬ ঘন্টা পর পর ৫ দিন খেতে হবে। এছাড়া কোনো এলাকায় বা বাড়িতে কেউ প্লেগে আক্রান্ত হলে একই নিয়মে কেমোপ্রোফাইল্যাক্সিস হিসেবে ৫ দিনের এক-কোর্স টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল খাওয়া বাঞ্ছনীয়।
* বিনা কারণে হঠাৎ করে কোনো স্থানে ইঁদুর বা কাঠবিড়ালি মরতে দেখলে স্বাস্থ্য বিভাগকে খবর দিতে হবে।
* ইঁদুর মারার পর গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা মৃত ইঁদুর পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

* ইঁদুরের আবাসস্থল বাড়ির আশ-পাশের ডোবা-জংগলের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করতে হবে অথবা জ্বালিয়ে দিতে হবে। বাড়ির আশ-পাশের অপরিস্কার স্থানে ডিডিটি পাউডার ছিটাতে হবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলতে হবে।

* প্লেগ-উপদ্রুত এলাকা (ভারত) প্রত্যাগতদের চেকপোস্টে ও বিমান বন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াও এদের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় দ্রুত পরিস্কার করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্লেগ রোগীর সংস্পর্শে যারা আসবেন অবশ্যই মুখে সবসময় মাস্ক বা কাপড়ের তৈরী আবরণ ব্যবহার করবেন। হাতের দস্তানা ও গাউন ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেকে ৫০০ মিলিগ্রাম টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল ৬ ঘন্টা পর পর ৭-১০ দিন খাবেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন ঃ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা

মোঃ হুমায়ুন কবির

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন গ্রহীতাদের একনাগাড়ে এ-পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সঠিক পরামর্শদান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে অংগাংগীভাবে জড়িত। কাজেই সঠিক পরামর্শদানের কাজটিও যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে হবে যা গ্রহণকারীর ইনজেকশন পদ্ধতি ব্যবহার দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠ-পর্যায় থেকে থানা-পর্যায় পর্যন্ত একটি চেইন সৃষ্টি বা সমন্বয় রক্ষা করা দরকার অর্থাৎ মাঠ-পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ সহকারী যতটুকুই দায়িত্ব রাখেন তিনি ততটুকু পালন করবেন। তার আওতা-বহির্ভূত ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রহীতাদের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বা চিকিৎসা সহকারীর নিকট প্রেরণ করবেন। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং চিকিৎসা সহকারীকে প্রয়োজনবোধে গ্রহীতাদের ব্যবস্থাপনার জন্য মেডিক্যাল অফিসারের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই প্রক্রিয়া যত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কাজটিও তত ত্বরান্বিত হবে।

যেহেতু কয়েকটি থানায় পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে, এসব থানায় পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনারও দায়িত্ব নেয়া দরকার। আমরা এ-ও জানি, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও চিকিৎসা সহকারী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই মাঠ-পর্যায় (ডেঃ) থেকে ইউনিয়ন-পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বা চিকিৎসা সহকারীর করণীয় কী তা নিচের ছকে আলোচিত হ'ল ঃ

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া	পরিবার কল্যাণ সহকারীর পরামর্শ/ব্যবস্থাপনা
১। মাসিক বন্ধ	ভালভাবে জানুন গর্ভাবস্থার কোনো লক্ষণ আছে কিনা। মহিলাকে বুঝিয়ে বলুন যে বেশির ভাগ ইনজেকশন গ্রহণকারীর মাসিক বন্ধ থাকতে পারে। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না। বুঝিয়ে বলার পরও মহিলা যদি খুব উদ্বিগ্ন থাকেন তবে ২১টি খাবার বড়ি (যদি প্রয়োগ নিষেধ না থাকে) ব্যবহারের পরামর্শ দিন এবং বড়ি দিয়ে দিন অথবা অন্য পদ্ধতির জন্য পরামর্শ দিন।
২। (ক) ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত যাওয়া (খ) তলপেটে চাকা অনুভব বা ভারী বোধ করা (গ) স্তন ভারী বোধ করা (ঘ) অস্বস্তি বোধ করা	২। (ক), (খ), (গ), (ঘ)-ভুক্ত মহিলাকে বুঝিয়ে বলুন। প্রথম কিছুদিন এরকম ছোটখাটো অসুবিধা হতে পারে। কিছুদিন ইনজেকশন ব্যবহার করলে সাধারণতঃ এসব অসুবিধা চলে যায়। (ক)-ভুক্ত মহিলাকে আশ্বাস দেয়ার কিছুদিন পরও যদি অবস্থার উন্নতি না হয় এবং মহিলা এ-ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে প্রতিদিন ১টি করে মোট ১০টি খাবার বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিন এবং বড়ি দিয়ে দিন।
৩। অতিরিক্ত মাসিক হওয়া	ভালভাবে প্রশ্ন করে জানুন অন্য কোনো অসুবিধা যেমন ঃ চাকা-চাকা রক্ত যাওয়া, তলপেটে ব্যথা, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ইত্যাদি আছে কিনা। যদি থাকে, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার কাছে প্রেরণ করুন। অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলে প্রতিদিন একটা করে ২১ দিন খাবার বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিন।
৪। ছোটখাটো সমস্যা যেমন: তলপেটে চাকা অনুভব করা, স্তন ফুলে-যাওয়া, সামান্য ওজন বেড়ে-যাওয়া, দুই মাসিকের মধ্যে কিছু কিছু রক্ত যাওয়া, অস্বস্তি বোধ করা।	মহিলাকে বুঝিয়ে দিন প্রথম কিছুদিন এরকম ছোটখাটো অসুবিধা হতে পারে। কিছুদিন ইনজেকশন ব্যবহার করলে সাধারণতঃ এসব অসুবিধা চলে যায়।

নিচের লক্ষণগুলো কদাচিৎ দেখা যায় অর্থাৎ খুব কম ক্ষেত্রে এ লক্ষণগুলো দেখা যায়। লক্ষণগুলো হলো ঃ

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া	পরিবার কল্যাণ সহকারীর পরামর্শ/ব্যবস্থাপনা
— প্রায়ই তীব্র মাথাব্যথা অনুভব করা — তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা — অতিরিক্ত রক্তস্রাব — ইনজেকশন নেয়ার জায়গা লাল-হওয়া/ফুলে-যাওয়া — অতিরিক্ত ওজন বেড়ে-যাওয়া	মহিলাকে বুঝিয়ে বলুন ইনজেকশন বন্ধ করে দেয়া তার জন্য ভাল হবে। তাকে মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন এবং কনডম দিয়ে দিন।

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বা চিকিৎসা সহকারী যেসব প্রশ্নাদি/পরীক্ষা করবেন অতঃপর যেসব পরামর্শ দান করবেন ও ব্যবস্থা নেবেন তা নিম্নরূপঃ

প্রশ্নাদি/পরীক্ষা

১। কতদিন থেকে ইনজেকশন নেয়া শুরু করেছেন?
কতদিন আগে শেষ মাসিক হয়েছে?
পরিবার কল্যাণ সহকারী কোনো চিকিৎসা করেছেন কিনা?
ইনজেকশন গ্রহণকারী গর্ভবতী কিনা পরীক্ষা করে দেখুন।

পরামর্শ/ব্যবস্থাপনা

১। যদি তিনি গর্ভবতী না হন এবং তিন মাসেরও কম সময় ধরে ইনজেকশন নিয়ে থাকেন তবে তাকে বুঝিয়ে বলুন ইনজেকশনের জন্য মাসিক বন্ধ থাকতে পারে, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

যদি মাসিক তিন মাসের বেশি বন্ধ থাকে এবং আশ্বস্ত করার পরও ইনজেকশন গ্রহীতা বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন, তাহলে প্রতিদিন ১টি করে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ২১ দিন খেতে বলুন এবং পরবর্তী মাসিক শুরু হওয়ার জন্য ৭ দিন অপেক্ষা করতে বলুন ও খাবার বড়ি সরবরাহ করুন। এরপরও মাসিক না হলে বিকল্প কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলুন। গর্ভবতী হলে তার ইচ্ছানুযায়ী এমআর বা মাসিক নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিন অথবা প্রসবপূর্ব যত্নের ব্যবস্থা করুন।

প্রশ্নাদি/পরীক্ষা

২। কতদিন থেকে ইনজেকশন নিচ্ছেন?

— খুব বেশি স্পটিং অর্থাৎ ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত যাচ্ছে কিনা?

— পরিবার কল্যাণ সহকারী স্পটিং এর জন্য কোনো চিকিৎসা করেছেন কিনা। প্রশ্নগুলোর উত্তরে স্পটিং-এর কারণ না বোঝা গেলে চিকিৎসকের মাধ্যমে পরীক্ষা করুন।

পরামর্শ/ব্যবস্থাপনা

২। তিনমাসেরও কম সময় ধরে ইনজেকশন নিয়ে থাকলে ছোটখাটো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ প্রথম তিন/চার মাসের মধ্যে চলে যায়-এ সম্পর্কে মহিলাকে বুঝিয়ে দিন। অনেক দিন যাবৎ স্পটিং হলে অথবা খুব বেশি স্পটিং হলে এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী কোনো চিকিৎসা না করে থাকলে প্রতিদিন ১টি করে বড়ি ১০ দিনের জন্য খেতে দিন। এরপরও যদি অতিরিক্ত স্পটিং হয় এবং মহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, তাহলে জরায়ু পরীক্ষা করুন। কোনো সংক্রমণ (ইনফেকশন) থাকলে চিকিৎসা করুন। কোনো কারণ খুঁজে না পেলে অথবা মহিলার কোনো স্ত্রীরোগ-সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন।

প্রশ্নাদি/পরীক্ষা

৩। (ক) মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন (কতদিন ধরে হয়; স্বাভাবিক সময়ের বেশি কাপড় বদলাতে হয় কিনা এবং দুর্বল লাগে কিনা?)

(খ) এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা আছে কিনা পরীক্ষা করুন।

(গ) তলপেটে ব্যথা, চাকা-চাকা রক্ত-যাওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ইত্যাদি লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষা করুন।

পরামর্শ/ব্যবস্থাপনা

৩। (ক) অতিরিক্ত মাসিক না হলে এবং রক্তস্বল্পতা না থাকলে মহিলাকে বলুন চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু যদি অতিরিক্ত মাসিক হয় এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী বড়ির মাধ্যমে চিকিৎসা না করে থাকেন, তাহলে ১টি করে খাবার বড়ি প্রতিদিন ২১ দিনের জন্য খেতে দিন। এরপরও যদি রক্তস্রাবের উন্নতি না হয় তবে ইনজেকশন বন্ধ করে দিন এবং মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন। অন্য কোনো অসুবিধা থাকলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

(খ) এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতার জন্য আয়রন ট্যাবলেট দিন (১টি করে দিনে ২ বার ১ মাসের জন্য)

(গ) মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন।

প্রশ্নাদি/পরীক্ষা

(ক) কোষ্ঠকাঠিন্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।

(খ) মাসিক বন্ধ আছে কিনা?

(গ) তিনমাসেরও কম সময় থেকে ইনজেকশন নিচ্ছেন কিনা?

পরামর্শ/ব্যবস্থাপনা

(ক) কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে অনেক বেশি পানি খেতে পরামর্শ দিন। তাকে বুঝিয়ে দিন কিছুদিনের মধ্যে এই অবস্থা সেরে যাবে এবং মাসিক বন্ধ থাকা মানে এই নয় যে তলপেটে রক্ত জমে যায়। এটি একটি ভুল ধারণা।

(খ) শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করুন, গর্ভবতী কিনা নিশ্চিত হোন, তাছাড়া তলপেটে টিউমার আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন।

(গ) প্রথম প্রথম এধরনের ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিছুদিন পর সেরে যাবে। মহিলাকে বুঝিয়ে বলুন ইনজেকশন বন্ধ করে দেয়া তার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে। তাকে মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন এবং কনডম দিয়ে দিন।

প্রসূতির জন্য সুষম খাদ্য

নাসিহা মজিদ

মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং তা বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় খাদ্যের তালিকা প্রণয়নে বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন একটি শিশুর খাদ্যতালিকা তৈরি করতে গিয়ে যেসব খাবার, তার পরিমাণ ও গুণগত মান বিবেচনা করতে হয় একজন পূর্ণবয়স্ক কর্মঠ পুরুষের খাদ্যতালিকায় সেসব বিবেচনা তা থেকে ভিন্নতর হবে। তেমনি একজন সাধারণ মহিলার খাদ্যতালিকার চেয়ে একজন প্রসূতির খাদ্যতালিকা তৈরি করার সময় বেশি যত্নশীল হতে হবে।

সন্তান প্রসবের সময় এবং তারপর প্রায় ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি ও খনিজ উপাদানের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। প্রসবকালীন রক্তক্ষরণের ফলে উদ্ভূত রক্তশূন্যতাই এর কারণ। আবার বুকের দুধ তৈরির জন্য মায়ের শরীরে পুষ্টির বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়। এসব ক্ষয়পূরণের জন্য তিনি বাড়তি খাবার না খেলে তার শরীরে পুষ্টির অভাব থেকেই যাবে অর্থাৎ তার জীবনীশক্তি কমে যাবে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়বেন ও নানা অসুখে ভুগবেন। তাছাড়া গর্ভকালীন সময়ে মায়ের শরীরে যদি কোনো পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকে তবে শিশু অপুষ্ট হয়ে জন্মাবে। এই শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে না। পুষ্টিহীন শিশুর বুদ্ধিমত্তা কম থাকে। এমনকি বড় হলেও তার এই অভাব পূরণ হয় না। সুতরাং একটি উন্নত জাতি গঠনে প্রসূতির খাবার পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে একজন সুস্থ মা দাও তাহলে আমি তোমাদের একটি সুস্থ জাতি দেব।"

খাদ্য কি?

মানুষের শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও সুস্থতার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস শরীরে সরবরাহ করতে হয় সেসব জিনিসই মূলতঃ খাবার বলে পরিচিত। কাজেই খাদ্য বা খাবারের কাজ হচ্ছে ঃ

(ক) শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করা
(খ) বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানো
(গ) বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করা

খাবারের উল্লিখিত ভূমিকা অনুসারে খাদ্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার
(২) শক্তিদায়ক খাবার
(৩) রোগ প্রতিরোধক খাবার

এছাড়া খাদ্যের উপাদান অনুসারে খাবারকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) আমিষ (২) শর্করা (৩) তেল (৪) ভিটামিন (৫) লবণ ও (৬) পানি। এর মধ্যে বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাদ্য হচ্ছে আমিষ, শক্তিদায়ক খাদ্য শর্করা ও তেল এবং রোগ প্রতিরোধক খাদ্য হলো ভিটামিন, লবণ ও পানি। একই খাবারে এই সবগুলো উপাদান থাকতে পারে, আবার কোনো উপাদান কোনো খাবারে বেশি, কোনো খাবারে কম থাকতে পারে।

সুষম খাদ্য কি?

শরীরের জন্য খাদ্যের যে ছয়টি উপাদান আছে তার সব ক'টিই একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই ক্ষিদে পেলে পেট পুরে খাবার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কী খাচ্ছি। তা নাহলে শরীর একটা উপাদান পাবে তো অন্যটা পাবে না। তাই শরীরের প্রয়োজন মেটাতে হলে প্রত্যেকেবারের খাবারে শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণের জন্য আমিষ, শক্তি যোগানোর জন্য শর্করা ও তেল এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন, লবণ ও পানি থাকতে হবে।

এবার প্রসূতির সুষম খাবারে কী কী থাকা দরকার তা আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ আমিষ থাকতে হবে। এই আমিষ প্রাণীজ ও উদ্ভিজ দু'রকমের হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সুষম খাদ্যে শক্তির জন্য শর্করা থাকতে হবে। শর্করা ছাড়াও তেল ও আমিষজাতীয় খাদ্য থেকেও আমরা শক্তি পাই। তবে প্রসূতির শক্তির জন্য শর্করা ও তেলজাতীয় খাবারের উপর নির্ভর করাই ভালো। আমিষজাতীয় খাবার থেকে শক্তি যোগাড় করা ঠিক নয়। এ–ব্যাপারে দু'টো জিনিস মনে রাখা দরকার ঃ

- প্রয়োজনের তুলনায় শর্করা ও তেল কম খেলে শক্তির জন্য শরীর অতিরিক্ত আমিষ ব্যবহার করে ফেলবে। ফলে শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণের কাজ ঠিকমত হবে না। সুতরাং পরিমাণমত আমিষ খেয়ে তা দিয়ে শিশুর ও মায়ের শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণের কাজ করতে হলে তার খাবারে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা এবং তেলজাতীয় খাবারও থাকতে হবে।
- আমিষের চাইতে শর্করা ও তেল দামেও অনেক সস্তা। সুতরাং শক্তির জন্য শর্করা ও তেলই উত্তম।

তৃতীয়তঃ যথেষ্ট পরিমাণে রোগ প্রতিরোধক উপাদান যেমন ভিটামিন ও লবণ প্রসূতির খাদ্যতালিকায় পরিমাণ মত থাকতে হবে। শাকসব্জী ও তাজা ফলমূল থেকে এগুলো সহজেই পাওয়া যায়। তাই প্রতিবেলার খাবারেই কিছু না কিছু সবুজ শাক, বিভিন্ন জাতের সব্জী ও ফলমূল থাকতে হবে।

প্রসূতির সুষম খাবারের আরেকটি উপাদান হলো বিশুদ্ধ পানি। মাকে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে যাতে নিজের শারীরিক প্রয়োজন মেটাবার পর বুকের দুধ তৈরির জন্য শরীরে পর্যাপ্ত পানি থাকে। একজন মা তার শিশুকে দৈনিক ৬০০–১০০০ মিঃলিঃ দুধ খাওয়াতে পারেন। তার শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি না পাওয়া গেলে মার শরীরে পরিমাণ মত বুকের দুধ তৈরি হবে না।

সবারই জানা আছে বুকের দুধ শিশুর জন্য একটি আদর্শ সুষম খাদ্য, কারণ বুকের দুধ বিশুদ্ধ, এতে কোনো রোগজীবাণু নেই, বরং রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। তৈরি করতেও কোনো ব্যবস্থা লাগে না। কাজেই একজন প্রসূতি যাতে তার সন্তানকে পাঁচমাস বয়স পর্যন্ত কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন এবং পরবর্তী কালে শিশুর দু'বছর বয়স পর্যন্ত অন্য খাবারের সাথে এই দুধ–খাওয়ানো চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য তাকে সুষম খাদ্য খেতে হবে। প্রাণীজ আমিষের উৎস হচ্ছে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি; আর উদ্ভিজ আমিষ পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের ডাল, চীনাবাদাম, সীম ও বরবটির বীচি, সয়াবিন, সবুজ শাক–পাতা ইত্যাদি থেকে। চাউল এবং আটায়ও কিছু আমিষ আছে।

প্রাণীজ আমিষ শরীরের বেশি কাজে লাগে। কারণ প্রাণীর শরীর আমাদের শরীরের মত রক্ত, মাংস, হাড় ও চামড়া দিয়ে তৈরী। কিন্তু গাছপালা মানুষের মত নয়। এই আমিষের কার্যক্ষমতা কম। অনেক খাবারে খুব কম আমিষ থাকে কিন্তু তার কার্যক্ষমতা থাকে অনেক বেশি। এ প্রসংগে ডিম ও বুকের দুধের কথা বলা যায়। এ দু'টোতে আমিষ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। কিন্তু এই আমিষ শতকরা একশ' ভাগই আমাদের শরীরের কাজে লাগে। তাই একে আদর্শ আমিষ বলে, কেননা ডিমে থাকে মুরগীর বাচ্চা বৃদ্ধির জন্য আমিষ আর বুকের দুধে থাকে মানব–শিশুর বৃদ্ধির জন্য আমিষ।

একজন সাধারণ মহিলা ও একজন প্রসূতির দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানের তুলনামূলক তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

উপাদান	সাধারণ মহিলা	প্রসূতি
শক্তি (ক্যালরি)	২২০০	২৮০০
আমিষ (গ্রাম)	৫০	৭৫
তেল (গ্রাম)	২০	৪৫
ক্যালসিয়াম (মিঃগ্রা)	৪০০	১০০০
লোহা	৩০	৩৮
ভিটামিন	৬০০ (রেটিনাল)	৯৫০ (রেটিনাল)
ভিটামিন–এ (মাইক্রোগ্রাম)	২৪০ (বিটা–ক্যারোটিন)	৩০০০ (বিটা–ক্যারোটিন)
থায়ামিন (মিঃগ্রা)	১.১	১.৪
রিবোফ্লোবিন (মিঃগ্রা)	১.৩	১.৬
নায়াসিন (মিঃগ্রা)	১৪	১৮
ভিটামিন–সি (মিঃগ্রা)	৪০	৮০
ফলিক এসিড (মাইক্রোগ্রাম)	১০০	১৫০

কোন্ খাদ্যের আমিষের শতকরা কত ভাগ আমাদের কাজে লাগে নিচে তার একটা হিসাব দেয়া হলো ঃ

ডিম ও বুকের দুধ	১০০%
গরুর দুধ	৭৫%
মাছ	৮৩%
মাংস	৭০%
চাল, আটা	২২%
ডাল, সীম, বরবটি, সয়াবীন	৪০%–৫০%

উদ্ভিজ আমিষের কার্যক্ষমতা কম হলেও খাবারে এই আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। যেমন ১০০ গ্রাম মাছে আমিষের পরিমাণ ১৫ গ্রাম এবং ১০০ গ্রাম মাংসে আমিষের পরিমাণ ২০ গ্রাম, কিন্তু ১০০ গ্রাম ডালে আমিষের পরিমাণ ২৫ গ্রাম। প্রসূতির খাবারে খনিজ ও উদ্ভিজ উভয় রকমের আমিষের ব্যবস্থা রাখা খুবই দরকার।

প্রসূতির খাদ্যতালিকা দামী খাবারেরও হতে পারে আবার সস্তা খাবারেরও হতে পারে। নিচে কয়েকটি সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হলো ঃ

(১) চাল বা গম + ডাল + শাক (পুঁই, ডাটা, পালং, কচু, লালশাক ইত্যাদি) + সব্জী (টমেটো, সীম, বরবটি, ফুলকপি, লাউ, করলা ইত্যাদি) — সস্তা খাবার।

(২) চাল বা গম + ডাল + সামান্য মাছ + শাক–সব্জী + ফল — সস্তা খাবার।

(৩) চাল বা গম + মাছ + ডাল + গরুর দুধ + শাক–সব্জী + ফলমূল — দামী খাবার।

(৪) চাল বা গম + মাংস + ডিম + ডাল + শাক–সব্জী + ফলমূল — দামী খাবার।

উদাহরণ স্বরূপ সারাদিনের একটি পূর্ণ খাদ্যতালিকা নিচে দেয়া হলো ঃ

খাদ্যের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)	শক্তি (ক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)
আমিষ			
মাছ/মাংস	১২০ [৩/৪ টুকরা]	১২০	২৪
ডিম	৫০ [১টা]	৯০	৭
ডাল	৩০ [রান্না ২ কাপ]	১০০	৭
দুধ	২৪০ [১ গ্লাস]	১৬০	৫
শর্করা			
চাল	২৫০ [৫ কাপ ভাত]	৮৭৫	১৫
আটা/ময়দা	১০০ [৫টা রুটি]	৩৫০	৯
মুড়ি/চিড়া	৩০ [দেড় কাপ]	১০৫	২
আলু	৬০ [ভাজা দেড় কাপ]	২১০	১
ভিটামিন ও লবণ			
শাক	২০০ [রান্না ১ কাপ]	—	৫
সব্জী	৫০০ [রান্না ২ কাপ]	১৫০	—
ফল [কলা, আম, পেঁপে ইত্যাদি]	কলা ১টা আম/পেঁপে ১/২টা	১০০	—
রান্নার তেল	৬০ [১/২ কাপ]	৫৪০	—
		২৮০০	৭৫

উল্লিখিত খাবারগুলো প্রসূতিকে দৈনিক পাঁচবার খেতে হবে। একটি দিনের বিভিন্ন সময়ের উপযোগী খাবারের তালিকা নিচে দেয়া হ'ল ঃ

সকালের নাস্তা	
আটার রুটি	৩ টা
ডিম ভাজা	১ টা
রান্না সব্জী	১ কাপ
কলা	১ টা
সকাল ১০ টায়	
আটার রুটি	২ টা
আলুভাজা	১/২ কাপ
দুধ	১ গ্লাস
দুপুরের খাবার	
ভাত	৩ কাপ
মাছ/মাংস	২ টুকরা
ডাল	১ কাপ
শাক	১/২ কাপ
সব্জী	১ কাপ
বিকাল ৪ টায়	
মুড়ি/চিড়া	১.৫ কাপ
আম/পেঁপে	২ টুকরা
রাতের খাবার	
ভাত	২ কাপ
মাছ/মাংস	২ টুকরা
ডাল	১ কাপ
সব্জী	১/২ কাপ

শেষ কথা ঃ সবশেষে যে কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি তা হলো সাধারণতঃ পরিবারে যতটুকু খাবারই আমরা খাই না কেন তা বিভিন্ন সদস্যের মাঝে অসমভাবে পরিবেশন করা হয়। আমাদের বাঙালি পরিবারের রীতি হলো রান্না করা সব ভালো খাবার প্রথমে বাড়ির বয়স্ক পুরুষেরা খান, তারপর শিশুরা, এবং সবশেষে খেতে বসেন মায়েরা। ততক্ষণে ভালো খাবারের তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না এবং পরিমাণও অপ্রতুল হয়ে যায়। প্রসূতিদের বেলায় যেন এমনটি ঘটতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অভ্যাস ও রীতির দোষে পরবর্তী প্রজন্মকে অপুষ্ট ও বুদ্ধিহীন ক'রে গড়ে তোলার অধিকার আমাদের নেই। কাজেই প্রসূতির খাবারের প্রতি বাড়ির সবাইকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

স্বাস্থ্য কুইজ-১০

১। গর্ভখালাসের সম্ভাব্য তারিখের ২ সপ্তাহের পরও যদি সন্তান না হয় তখন করণীয় কি?

২। একজন নবজাতকের তাপমাত্রা, হৃদস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সাধারণতঃ কত হলে স্বাভাবিক বলা যাবে?

৩। ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ বলতে কি বোঝেন? ৫টি লক্ষণ উল্লেখ করুন।

৪। দীর্ঘ-মেয়াদী ডাইরিয়ার কারণে কি কি জটিলতা দেখা দিতে পারে?

৫। নরপ্লান্টে কোন্ হরমোন আছে? নরপ্লান্টের কার্যকারিতা কত বৎসর?

স্বাস্থ্য কুইজ-৯ এর উত্তর

১। যেকোনো ধরনের নলকূপ থেকে কাঁচা ল্যাট্রিনের দূরত্ব ৫০ ফুট বা ১৫ মিটার হওয়া উচিত।

২। 'ল্যাথারিজম' রোগের জন্য খেসারী ডালের যে বিশেষ উপাদানটি দায়ী তার নাম বিটা এন-এক্সাইল অ্যামাইনো এসিড (BOAA).

৩। গর্ভকালীন সময়ে সাধারণতঃ ২৪ পাউন্ড বা ১১ কেজি ওজন বৃদ্ধি পায়

৪। কোনো শিশু পুনঃপুনঃ গলাব্যথায় আক্রান্ত হলে রিউম্যাটিক ফিবার (Rheumatic Fever) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৫। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরে মোট ৩-৪ গ্রাম আয়রন থাকে?

স্বাস্থ্য কুইজ-৯ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

১। কামাল আহমেদ বাবু
প্রযত্নে ঃ শাহনূর আলম
কাপ্তান বাজার, কার্জন কুটির
কুমিল্লা ৩৫০০

২। মোঃ মুফতিনূর রহমান
পিতা ঃ মোঃ মসলেম আলী মিয়া
গ্রাম ঃ বাবুপাড়া
ডাকঘর ঃ আলমডাঙ্গা ৭২১০
জেলা ঃ চুয়াডাঙ্গা

৩। কামাল
সেনবাগ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
সেনবাগ, নোয়াখালী

জেনে রাখা ভাল

কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবেন

অজ্ঞান হয়ে-পড়া বা unconsciousness একটি জরুরী স্বাস্থ্যসমস্যা। বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে অথবা চলার পথে যেকেউ আকস্মিকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন বা সাময়িক মূর্ছা যেতে পারেন অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী সংজ্ঞা লোপ পেতে পারে। ক্ষণস্থায়ী সংজ্ঞা লোপ পাওয়াকে Fainting বা মূর্ছা-যাওয়া বলা হয়। এক্ষেত্রে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না। কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা অথবা দুঃসংবাদ শুনলেও এমন হতে পারে। এধরনের

অজ্ঞান হয়ে-পড়ার ক্ষেত্রে যা যা করতে হবে তার একটি বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

(ক) রোগী যদি মূর্ছা যায়

* দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় কেউ মূর্ছা যেতে পারেন। এক্ষেত্রে যদি সে-অবস্থায় কারও সংজ্ঞা লোপ পায় তবে তাকে শুইয়ে দেয়ার চেষ্টা না করে মাথা নিচু করে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিন যাতে মাথা দু'পায়ের মাঝ বরাবর থাকে। রোগীকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে আরামে বসতে বলুন। লক্ষ্য রাখুন রোগী যাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে না পড়ে।

* পরে যখনই সম্ভব হয় রোগীকে বিছানায় অথবা মাটিতে শুইয়ে দিন। মাথা নিচের দিকে এবং পা কিছুটা উপরের দিকে তুলুন। পায়ের নিচে বালিশ অথবা কাপড় ভাঁজ করে দিলেও হয়। কোমরের বেল্ট, গলার টাই, শার্টের বোতাম খুলে দিন অর্থাৎ কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে।

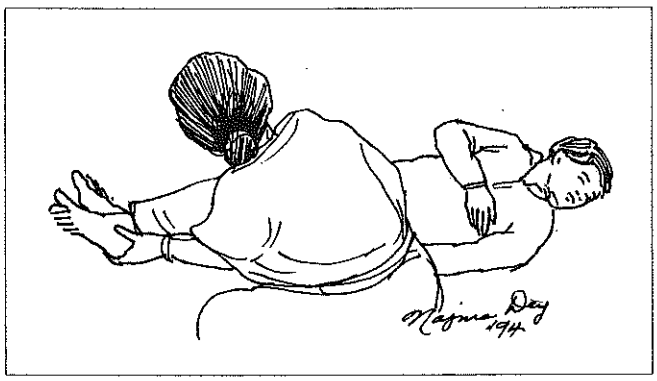

* যদি তার জ্ঞান ফিরে আসে তবে আস্তে-আস্তে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বলুন।

* আরোগ্য লাভের সাথে-সাথে ঠান্ডা পানি খেতে দিন।

* রোগীকে ধীরে-ধীরে বসতে বলুন।

রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়লে

* অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে জিহ্বা সাধারণতঃ মুখের পিছনের দিকে পড়ে শ্বাসনালীর ছিদ্রপথ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে। এজন্য মাথাটা ঈষৎ ডানদিকে বাঁকিয়ে দিন। এতে জিহ্বা চোয়ালের সাথে উঠে আসবে এবং শ্বাসনালীর ছিদ্রপথ খুলে যাবে। কিন্তু ঘাড় বাঁকাবেন না। রোগীর মুখগহ্বর পরিস্কার করে দিতে হবে। মুখের মধ্যে বমির অংশ, রক্ত অথবা বিচ্যুত দাঁত থাকলে তা পরিস্কার করে দিতে হবে। জিহ্বা দাঁতের নিচে কাটা পড়লে দ্রুত মুখের ভিতর কাঠের টুকরা, চামচ বা কাপড় ভাঁজ করে দিতে হবে যাতে মুখ খুলে যায়।

* প্রয়োজন হলে রোগীকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে চেষ্টা করুন।

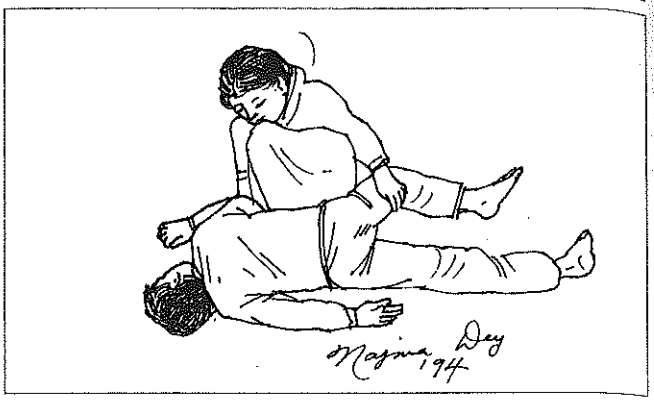

* রোগীর শরীরে কোনো স্থানে জখম থাকলে যথাযথ ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ করে রক্ত বন্ধ করুন। শরীরে কোথাও হাড় ভেংগে গিয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। যদি কোথাও হাড় ভেংগে গিয়েছে বলে মনে হয় তবে রোগীকে নাড়াচাড়া করবেন না। সম্ভব হলে রোগীকে ডান কাঁধের ওপর ভর করে লম্বাভাবে শুইয়ে দিন যাতে বামহাতের কনুই ও বামহাটু শরীরের সাথে সমকোণ তৈরি করে (রিকভারি পজিশন)। শরীরে কম্বল বা অন্য কাপড় দিন।

* সম্ভব হলে রোগীর কাছে একজন অবস্থান করুন এবং অন্য কাউকে ডাক্তার ডাকতে পাঠান অথবা রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করুন।

সতর্কতা

* অজ্ঞান-হওয়া রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা। রোগীর জিহ্বা শ্বাসনালীর ছিদ্র বন্ধ করেছে কিনা তা জরুরীভাবে দেখতে হবে।

* রোগীর মাথার নিচে বালিশ থাকলে সরিয়ে দিতে হবে।

* রোগীকে নাড়া-চাড়া করার আগে অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসা যেমন: রোগীর মুখগহ্বর পরিস্কার ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

* রোগীর ঘাড় বাঁকানো যাবে না।

* রোগীকে কোনো অবস্থাতেই কোনো তরল খাবার বা ফ্লুয়িড মুখে দেয়া যাবে না। (শ্বাসনালীতে ঢুকে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে)।

* রোগী যাতে প্রচুর আলো-বাতাস পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর পাশে অহেতুক ভিড় করা যাবে না।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হ্যবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ কামরুন নাহার, মুঁজিবুর রহমান ও ডাঃ তানজিনা মির্জা; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী

প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০

ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বিজে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ